অন্বেষণ

রাধুর তিন সখী : সরস্বতী, নন্দরানি ও উমা

তড়িৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীশ্রীমায়ের স্নেহধন্যা রাধারানি ওরফে রাধুর বন্ধুদের প্রসঙ্গ শ্রীশ্রীমায়ের প্রামাণিক জীবনীগ্রন্থে পাওয়া যায় না। রাধুর ক্ষেত্রে সন্তান প্রতিপালনের এক বেনজির দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেছেন সারদা দেবী—যা যেকোনও অভিভাবকেরই শিক্ষণীয়। শ্রীশ্রীমা রাধুকে লেখাপড়া শিখিয়েছেন, গানের তালিম দিয়েছেন, শিষ্টাচার শিক্ষা দিয়েছেন, তার শখ-আহ্লাদপূরণে যথাসাধ্য সচেষ্ট থেকেছেন এবং তাকে সামাজিক করে তোলার জন্য বন্ধু সংসর্গে তার মেলামেশার সুযোগ করে দিয়েছেন। রাধুর সখীরা রাধুর তুল্যই শ্রীমায়ের অসীম স্নেহের অধিকারী হতে পেরেছে। মাতৃপ্রভাবে তারা নিজেদের জীবনকে পরিশীলিত করেছে এবং তাকে উৎকর্ষের পথে চালনা করেছে।

সরস্বতী দেবী

সরস্বতী দেবী ছিলেন জয়রামবাটীতে শ্রীশ্রীমার নিকটতম প্রতিবেশী রামপদ ঘোষের কন্যা। তিনি ছিলেন রাধুর প্রায় সমবয়সি এবং তাঁর সই। সরস্বতী দেবীর শ্বশুরবাড়ি জয়রামবাটীর নিকটস্থ গ্রাম পুকুরিয়ায়। তাঁর তৃতীয় পুত্র রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসী স্বামী শান্তিদানন্দ (কান্ত মহারাজ)। সরস্বতী দেবীর মধ্যম পুত্র চিত্তরঞ্জন ঘোষের কাছে লেখক এ-বিষয়ে কিছু তথ্য জেনেছিলেন (২৫ ডিসেম্বর ১৯৯৮)। চিত্তরঞ্জন তাঁর মায়ের মুখে শুনেছেন, রাধু ও সরস্বতী একত্রে খেতেন, খেলতেন, বেড়াতে যেতেন। তাঁদের খেলা ছিল কবাডি, চোর-বুড়ি, এক্কা-দোক্কা, ঘুশিম প্রভৃতি। তাঁরা যে-ব্রতগুলি একত্রে পালন করতেন তা হল পুণ্যিপুকুর, শিবরাত্রি ও জয়মঙ্গলবার। একসঙ্গে দুজনে ধর্মরাজতলা, শীতলাতলা ও সিংহবাহিনীর মাড়োতে পূজা দিতে যেতেন। শ্রীশ্রীমা যখন রাধুকে গান শেখাতেন তখন সরস্বতীকেও ডেকে নিতেন। একটু বড় হলে সরস্বতীকে মা বলতেন, ‘‘ঘুম থেকে উঠেই আগে ঠাকুরের মুখ দেখবি। ঠাকুরের নাম স্মরণ করবি তারপর মুখ-হাত ধুবি, দাঁত মাজবি, ঘাটে যাবি।’’ আরও বলেছিলেন, ‘‘সংসারের সব কাজই ঠাকুরের পুজো মনে করে করবি, তাহলে কাজটা নিখুঁত হবে আর মনেও শান্তি পাবি।’’

অতঃপর সরস্বতী দেবীর স্মৃতিকথা অনুসরণ করি : ‘‘আমরা জগজ্জননী বলে শ্রীশ্রীমাকে চিনতে পারিনি। রাধুদি, মাকুদির মতো আমরাও পিসিমা বলতাম শ্রীশ্রীমাকে। বাড়িতে পাল-পার্বণে কোন কিছু তৈরি হলে পিসিমা বলতেন ‘সারি’কে ডেকে

নিয়ে আয়। 'সারি' আমার ডাক নাম। ঐ নামেই পিসিমা আমাকে ডাকতেন। রাধুকে ডাকতেন 'রাধি' বলে। ছোটবেলায় রাধুদি আমার খেলার সাথী ছিলেন। একটু বড় বয়সে রাধুদির সঙ্গে সই পাতাই। আমাদের বাড়ির পাশেই পিসিমাদের বাড়ি। সেই কারণে যখন-তখন ও-বাড়িতে আমি হাজির থাকতাম। ওদের সঙ্গেই আমি পিসিমার কাছে যেতাম। তিনি কখনো ফল দিতেন, কখনো নাড়ু, কোনদিন ডুমুরের ডালনা বা মোচার তরকারি। রাধুদির মাথায় গোলমাল থাকলেও আমার সঙ্গে ভালভাবেই কথাবার্তা বলত। প্রথম বাচ্চাটা মারা যাওয়ার পর রাধুদির মাথার গোলমালটা বেশি হয়েছিল। পরে অবশ্য অনেকটাই সুস্থ হয়েছিল। রাধুদিই আমার খেলার প্রধান সঙ্গী ছিল। কুলগাছ থেকে কুল পাড়তে, খেজুর তলা থেকে খেজুর কুড়ুতে, এমন বহু জায়গায় দুজনে মিলে গেছি। আমি রাধুদির কাছে সবসময় থাকতাম বলে কি-না জানি না, মায়ের স্নেহ-ভালবাসা পেয়েছি পর্যাপ্ত। পিসিমা দুধ থেকে ক্ষীর করতেন। আমি ও বাড়ি গেলে তিনি বলতেন, সারি একটু খাবি? আমি 'হ্যাঁ' বলার সঙ্গে সঙ্গে পিসিমা ক্ষীর এনে দিতেন। পিসিমার তৈরি গুড়আমও (আমের আচার) খুব সুন্দর। পিসিমার হাতে তৈরি কতরকমের খাবার যে খেয়েছি তার ইয়ত্তা নেই।

''আমার নিজেকে ভাগ্যবতী বলে মনে হয়, কারণ পিসিমা বহুদিন আমার চুল বেঁধে দিয়েছেন। আমার চুল খুব বড় ছিল বলে তিনি প্রশংসা করতেন খুব। পিসিমার নিজের মাথার চুলও ছিল খুব বড়।...

''আমার বিয়ের সময় পিসিমা জয়রামবাটীতে ছিলেন না। তিনি যখন জয়রামবাটী ফিরলেন, বাবা আমাকে ও তাঁর জামাইকে নিতে এসেছিলেন পিসিমাকে জামাই দেখাবেন বলে। আমরা জয়রামবাটী এসে তাঁকে প্রণাম জানালে তিনি একটি টাকা দিয়ে আমাদের আশীর্বাদ করেছিলেন। পিসিমা বলেছিলেন, 'মা সুখী হও—ঠাকুরে যেন মতি হয়।' মায়ের কথা মিথ্যা হওয়ার নয়, তিনি যা বলেছেন, তাই-ই বর্ণে বর্ণে ফলেছে।

''আমি ও আমার দিদি বাপের বাড়ি আসা-যাওয়া করতাম। বেশি দিন জয়রামবাটীতে থাকতাম না। তখন নলিনীদি, রাধুদি ও মাকুদির বিয়ে হয়ে গেছে। তারা শ্বশুরবাড়ি যায় না; বাপের বাড়িতেই বেশির ভাগ সময় থাকে। পিসিমা আমাদের দেখিয়ে বলতেন, 'দেখ, রামের (রামপদ ঘোষ) মেয়েরা কেমন লক্ষ্মী! শ্বশুরবাড়ি করে—আবার ইচ্ছা হলে বাপের বাড়িও আসে, তবে বেশিদিন বাপের বাড়িতে থাকে না। মেয়েদের শ্বশুরবাড়িই আসল ঘর। মেয়েদের বিয়ের পর শ্বশুরবাড়ি না গেলে কি ভাল দেখায়? এদের (নলিনী, মাকু ও রাধু) এত করে বলি তোরা মাঝে মাঝে গিয়ে শ্বশুরবাড়ি থাক। আমি লোক পাঠাব—খোঁজ খবর নেব। তা আর শুনল কই এরা।''[১]

নন্দরানি দেবী

রাধুর সখী নন্দরানির কথা জানিয়েছেন স্বামী নির্লেপানন্দ : ''উদ্বোধনের সরাসরি দক্ষিণ দিকে ... ভাঙ্গা ঝড়ঝড়ে কিন্তু এককালে বনিয়াদি বামুনবাড়ির মেয়ে নন্দ, মাতৃহীনা। পিতা নেশায় শরমজ্ঞানহীন। নবকার্ত্তিকের মত চেহারা, টিকোলো নাক, দুধে আলতা রং। বুড়ো পিতামহ... নেশায় সদাই রাঙা চক্ষু। ছতিচ্ছন্ন [মতিচ্ছন্ন?] মা বিহীন সংসার। কে ছেলে, কে মেয়ে, কে কাকে দেখে, গোছের ভাব। অনেকগুলি ভাইবোন। নন্দ, সুলক্ষণা সুরূপা সুভাষী। রাধুর সই। এক সঙ্গে পুতুল খেলা আমোদ আহ্লাদ।... মা নন্দকে বড় স্নেহ কোরতেন। খুব ভাল ভাল মেঠাই সন্দেশ ফলমূল প্রসাদ বেশী করে দিতেন যাতে বাড়ীর সবাই মিলে খেতে পারে...।... রাধু এক-একদিন দেখেছি, নন্দর বাড়ি গিয়ে এত খেলায় মেতে যেত যে,... পিসিমার নাম কোরে

ডাকলেও আসতো না। মা নিজে খিড়কী দিয়ে গিয়ে... রাধুকে ধরে আনতেন। নন্দ মাকে দিদিমা বলতো। বড় মিষ্টি লাগতো।

''মা খেকো নন্দও মায়ের অগাধ স্নেহধন্যা।... গোলাপমাও মার দেহান্তের পর চার বছর আমরণ নন্দকে অনেক কিছু দিয়ে থুয়েছেন।''[২]

নন্দ সম্পর্কে আরও জানা যায় দেবেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলির ডায়রি থেকে (তিনি মায়ের বাড়িতে থেকে পড়াশোনা করতেন), যা তিনি জেনেছেন গণেন্দ্রনাথের কাছে : ''মায়ের বাড়ির কাছে ছিল এক ব্রাহ্মণ পরিবার। কর্তার নাম খোকন চাটুজ্যে। গিন্নি অকালে চলে গেল। চাটুজ্যের মেয়ে নন্দরাণী মায়ের রাধুর সই। সেই সুবাদে সে সদাই রাধুর কাছে থাকত। মা মেয়েটিকে খুব ভালবাসতেন। রাধুর জন্য নতুন কাপড় এলে নন্দকেও একটা দিতেন। মা চলে যাওয়ার পর গোলাপ মা নন্দকে খুব টানতেন। টাকাকড়ির অভাবে তার বাবা তার বিয়ের দেখাশোনা করছেন না দেখে, গোলাপ মা একদিন তার বাবাকে বলে বসলেন, নন্দ বড় হয়েছে দেখতে পাচ্ছ না? বিয়ের দেখাশোনা কর। ওর মা থাকলে এতকাল কবে ওর বিয়ে হয়ে যেত! পরে শুনলাম জনৈক সহৃদয় ব্যক্তি নন্দকে দেখে পছন্দ হওয়ায় নিজেই খরচপত্র দিয়ে বিয়ে করে নিয়ে গেছে। যদিও নন্দ বরের দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী হয়েছিল, তবুও সে সুখে আছে জেনে মনে আনন্দ হয়। নন্দের দাদা ফণীন্দ্র বলে, ও-বাড়ির মা (শ্রীশ্রীমা) বোনের মাথায় হাত রেখে আশীর্বাদ করে বলে গেছেন, 'মা, ঠাকুর তোর ভাল করবেন।' নন্দ ঠাকুর ও মায়ের আশ্রিতা। মা তাকে ডেকে ধরে মন্ত্র দিয়ে গেছেন। তার কি কখনও খারাপ হয়?''

উমা দেবী

রাধুর তৃতীয় সখী উমার সংবাদ জানিয়েছেন দুর্গাপুরী দেবী : ''একটি কন্যা সমস্ত দিন রাধারাণীর সঙ্গেই মায়ের বাটীতে থাকিত; সে উমা—জয়রামবাটী অঞ্চলের এক বালবিধবা। কলিকাতায় মায়ের বাটীর নিকটেই মাতামহীর সহিত সে বাস করিত। রাধারাণীর সহিত সমান যত্নে, অন্নবস্ত্রে মা তাহাকেও পালন করিয়াছেন। মা উমাকে স্বহস্তে তৈল মাখাইয়া দিতেন, স্নান করাইয়া দিতেন, খাইতে দিতেন। জনৈকা মহিলা একদিন মন্তব্য করেন,—আচ্ছা মা, উমা তিলির মেয়ে, আর রাধু বামুনের মেয়ে, তোমার ভ্রাতুষ্পুত্রী, তুমি কি করে ওকে রাধুর মর্যাদা দিচ্ছ? এতে উমার অপরাধ হচ্ছে, ওরই ভবিষ্যৎ খারাপ হবে।

''মা স্নেহার্দ্রকণ্ঠে উত্তর দিলেন,—ওর জন্যে বড় ভাবনা হয়, অতটুকু মেয়ে,—বিধবা! ঠাকুর যেন ওর মান-ইজ্জত রক্ষে করেন।... অন্য একজন মন্তব্য করেন,—হ্যাঁ মা, আপনি তো ওকে খুবই আদরযত্ন কচ্ছেন, বড় হলে ও যদি আপনার কথা না মেনে চলে? ঈষৎ হাসিয়া মা বলিলেন,—আমার স্নেহ-আশীর্বাদ বিলিয়ে যাচ্ছি; তারপর যার যেমন ভাগ্যি, আর ঠাকুরের ইচ্ছে!''[৩]

জয়রামবাটীর চিত্ত মণ্ডল (২০২০ সালে ছিয়াশি বছর বয়স্ক) জানান যে, শশিভূষণ মণ্ডলের তিন পুত্র ছিলেন : গোপাল, গোকুল ও নকুল। তিন ভাই-ই মাকে দর্শন করেছেন। গোকুল কলকাতায় এক মাড়োয়ারির তেলমিলের ম্যানেজার ছিলেন; পরে ওই মিলের মালিক হন। নকুলও ওই মিলে কাজ করতেন। গোকুল নিঃসন্তান। এক বন্ধুর মেয়েকে দত্তক নিয়ে মানুষ করেছিলেন। তার নাম উমা। গোকুলের শ্বশুরবাড়ি ছিল বাগবাজারে। বন্ধু ও বন্ধুপত্নী অকালে মারা গেলে উমা তাঁদের কাছেই প্রতিপালিত হয়। দশ বছর বয়সে এক ধনিগৃহে গোকুল কন্যার বিয়ে দিয়েছিলেন। বিয়ের দু-বছরের মাথায় জামাতা মারা যায়। উমা ছিল রাধুর সমবয়সি। তারা পরস্পর সই পাতিয়েছিল। উমা তার পালক বাবা-মার সঙ্গে কয়েকবার দেশে

এসেছে। দেশে এলে মায়ের বাড়িতেই সবসময় থাকত সে।

গণেন্দ্রনাথের কাছ থেকে জেনে পূর্বোক্ত দেবেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলি তাঁর ডায়রিতে লিখেছেন : ''মায়ের বাড়িতে রাধুর সঙ্গে প্রতিপালিত হত জয়রামবাটী গ্রামের উমা। তার দিদিমার বাড়ি ছিল বাগবাজারে মায়ের বাড়ির নিকটেই। সে রাধুর সঙ্গে ওয়েসলিয়ান মিশনারি স্কুলে পড়ত। শ্রীশ্রীমা তাকে মন্ত্রদীক্ষা দিয়েছিলেন। আমরা শুনেছি, মা তাকে বোঝাতেন, বলতেন—মা তুই হাতের কাজ শেখ। শশি ডাক্তারের পরিবার বিধবাদের নানারকম সেলাই, খাবার তৈরি, আরও কত কি শেখায়। আমি বলে দেব; তুই তার কাছে যাবি। খুব ভালমানুষ।

''উমা শান্তশিষ্ট। লক্ষ্মীর মতো গড়ন। খুব পরিশ্রমী ছিল। মায়ের কথামতো শশিভূষণবাবুর স্ত্রীর কাছ থেকে খুব ভাল সেলাই শিখে, পরে সে অন্য মেয়েদের সেলাই শেখাতে লেগেছিল। সত্যই সে ছিল মায়ের হাতে গড়া প্রতিমা। কম বয়স থেকেই গরিব দুঃখীদের জন্য তার সহানুভূতি দেখে আমরা মুগ্ধ হয়েছি। তার বাবার স্বাচ্ছন্দ্য ছিল। তখন বাগবাজারে বস্তি ছিল অনেকগুলি। মায়ের দেহান্তের পর শরৎ মহারাজের কাছে এসে চুপটি করে বসে থাকত। মহারাজ বলতেন, কী উমা মা, কী সংবাদ? সে বলত, মহারাজ, মাকে আর আপনাকে প্রণাম করতে এসেছি। এই কথাগুলো বলার সঙ্গে সঙ্গে তার দুচোখ ভরে জলধারা নামত। মহারাজ বলতেন, আমার মায়ের চোখের জল তো আমি দেখতে পারব না। আগে চোখ মোছ—মা! তারপর কথা হবে। ইত্যবসরে কোনও সেবককে ডাকিয়ে মায়ের প্রসাদ আনিয়ে নিতেন। উমাকে উদ্দেশ্য করে মহারাজ বলতেন, মা—প্রসাদটা আগে খেয়ে নে। উমা প্রসাদ খেয়ে মহারাজকে নিবেদন করল, মহারাজ! একটা কাজের জন্য আপনার মতামত নিতে এসেছি।

''মহারাজ বললেন, কি কাজ রে মা?

''উমা : মহারাজ, দেখেছি বস্তির বড় বড় মেয়েরা ছেঁড়া কাপড় পরে ঘুরে বেড়ায়। আমার খুব কষ্ট হয় ওদের দেখে। বস্তির ছোট ছোট মেয়েদের জন্য আমি অনেকগুলো ফ্রক তৈরি করেছি। সেগুলো আমি আপনার কাছে জমা দিয়ে যাব। আপনি যা ভাল বুঝবেন, তাই করবেন।

''মহারাজ বললেন, তোর কথায় এবার আমার চোখে জল চলে এল। আমাদের মা সত্যিই তোকে নিজের হাতে মানুষ করেছেন, প্রাণভরে তোকে আশীর্বাদ করেছেন, তাই দুঃখী-আর্তদের জন্য তোর এত ব্যথা—এত দরদ!... তোকে বস্তিতে যেতে হবে না। যা তৈরি করেছিস, এখানেই দিয়ে যাবি। আমি ওদের ডাকিয়ে সেগুলো দেওয়ার ব্যবস্থা করব। তখন তোকে ডাকব। সে খুশি হয়ে মহারাজকে প্রণাম করে বাড়ি চলে গেল।

''উমার গানের গলাও ছিল ভাল। সে প্রায়ই মায়ের বাড়িতে আসত। মহারাজের যখন কাজের ব্যস্ততা কম থাকত, উমাকে ডেকে বলতেন, মা দু-একটা ভজন শোনা ত!

''উমা ভজন গেয়ে মহারাজকে শোনাত। যখন সে গান গাইত, তখন তার দু-চোখ বেয়ে নেমে আসত জলের ধারা।

''তবে উমা দীর্ঘায়ু হতে পারেনি। ত্রিশ বছরের মধ্যেই সে হঠাৎ জ্বরে আক্রান্ত হয়ে ইহলোক ত্যাগ করে।'' ✠

তথ্যসূত্র

১। তড়িৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, *নবযুগের দিশারী, শ্রীশ্রীমা সারদা দেব* সাহিত্য কুটীর প্রাইভেট লিমিটেড, ২০১৪, পৃঃ ৩৬০-৬১
২। স্বামী নির্লেপানন্দ, *রামকৃষ্ণ সারদামৃত*, করুণাময়ী প্রকাশনী, ১৯৬৮, পৃঃ ১৬৯
৩। শ্রীদুর্গাপুরী দেবী, *সারদা রামকৃষ্ণ*, শ্রীশ্রী-সারদেশ্বরী আশ্রম, ১৩৬১, পৃঃ ২২৭-২৮